ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি এলে ভাষাচর্চার কথা বলা আর বছরের অন্য মাসে ভুলে থাকা, এটা ঠিক নয়: হাসনাত আরিয়ান খান

শামসুল ইসলাম: 'অবিভক্ত বাংলা আন্দোলন', 'মহা বাংলা আন্দোলন' বা 'বৃহত্তর বাংলা আন্দোলন' না বলে আপনারা 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' কেনো বলছেন? 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' বলতে আপনারা আসলে কী বুঝিয়েছেন? বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত চলছে। পার্বত্য অঞ্চলকে কিভাবে সুরক্ষা করবেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। নাম নিয়ে আমরা অনেক গবেষণা করেছি, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। 'বঙ' বা 'বঙ্গ' হতে 'বাঙ্গালাহ', 'বাংলা' বা 'বঙ্গদেশ' হতে 'বাংলাদেশ'। মধ্যযুগের সাহিত্যে এমনকি উনিশ শতকের সাহিত্যেও সম্পূর্ণ বাংলা অঞ্চলকে "বঙ্গদেশ" বা "বাংলাদেশ" বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে "বঙ্গদেশ" শব্দের উল্লেখ আছে। তিরিশের দশকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় "বাংলাদেশ" নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। আবার সত্যজিত রায়ের চলচ্চিত্রেও "বাংলাদেশ" নামটি উচ্চরিত হয়েছে। একাত্তরে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রবাসী অস্থায়ী সরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে 'বাংলাদেশ' নামটি ব্যবহার করেছে। পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সাংবিধানিক নাম হিসেবেও 'বাংলাদেশ' নামটিই বেছে নেয়া হয়েছে। সুদূর প্রসারী চিন্তা থেকেই এটা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বাংলা অঞ্চলকে মাথায় রেখেই দেশের নাম "বাংলাদেশ" রাখা হয়েছে। একারণে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার পরপরই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কণ্ঠে 'বাংলাদেশ' এর স্বাধীনতা ও মানচিত্রের অপূর্ণতার কথা উচ্চারিত হয়েছে। 'বাংলাদেশ' এর স্বাধীনতা ও মানচিত্রের পূর্ণতা দিতেই 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর জন্ম হয়েছে। একখণ্ড হলেও "বাংলাদেশ" নামে একটি রাষ্ট্র যেহেতু আমরা কায়েম করে ফেলেছি, অন্যান্য খণ্ড অংশগুলোকে এর সাথে যুক্ত করে 'অখণ্ড বাংলাদেশ' কায়েম করাই আমাদের কাছে অধিকতর সহজ ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। 'অখণ্ড বাংলাদেশ' বলে 'বাংলাদেশ'কে খণ্ডিত বুঝানো হয়েছে। প্রজন্মকে বার্তা দেয়া হয়েছে, এখানেই থেমে গেলে চলবে না। সমগ্র বাংলা অঞ্চলকে 'বাংলাদেশ' এর সাথে অন্তর্ভূক্ত করে 'অখণ্ড বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন করতে হবে। সম্পূর্ণ বাংলা অঞ্চলকে নিয়ে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একাত্তর সালে 'বাংলাদেশ' এর একখণ্ড আমরা পুনরুদ্ধার করেছি, বাকি খণ্ড খণ্ড অংশগুলোকে দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে হবে। 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' নামের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগকে স্বীকার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায় সমগ্র বাংলা অঞ্চলের মানুষের অবদান স্বীকার করা হয়েছে। আমাদের সহযোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া 'বাংলাদেশ' নাম কায়েম হবার পরে 'অবিভক্ত বাংলা', 'মহা বাংলা' এই নামগুলো ইধপশফধঃবফ হয়ে গেছে। 'বাংলাদেশ' নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর 'অবিভক্ত বাংলা', 'মহা বাংলা' নামে আন্দোলন 'বাংলাদেশ' এর জন্য আমাদের কাছে অমর্যাদাকর মনে হয়েছে। তাছাড়া পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হওয়ার পর 'অবিভক্ত বাংলা আন্দোলন' নামে বাংলাদেশের নোয়াখালি অঞ্চলে একসময় ' RAW' এর পৃষ্ঠপোষকাতায় একটা আন্দোলন চলছিলো। 'মহা বাংলা আন্দোলন' নামে পশ্চিমবঙ্গেও ' RAW' এর পৃষ্ঠপোষকতায় একটা আন্দোলন চলছিলো। এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই ছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেই তারা অস্বীকার করছিলো। ইত্যাদি বিবেচনায় সজ্ঞানে ও সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে এই নামগুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আপনি বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তের কথা বলেছেন। 'অখণ্ড বাংলাদেশ' নামের ভেতরেই এর সুরক্ষা আছে।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: আপনি 'বঙ' বা 'বঙ্গ' হতে 'বাঙ্গালাহ', 'বাংলা' বা 'বঙ্গদেশ' হতে 'বাংলাদেশ' এর কথা বললেন। 'বঙ' বা 'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি কোথা থেকে হলো?

হাসনাত আরিয়ান খান: কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, বাঙালি জাতির উৎপত্তি আদি পুরুষ নূহ (আঃ) এর প্রপৌত্র 'বঙ' বা 'বঙ্গ' হতে। এ প্রসঙ্গে গবেষক ড. মোহাম্মদ হান্নান তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' বইয়ে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলীম জায়েদপুরী'র রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থ থেকে 'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। ড. মোহাম্মদ হান্নান লিখেছেন, "হযরত আদম (আঃ) থেকে আমাদের এই মানব জাতির শুরু। কিন্তু নুহ (আঃ) সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে এক মহাপ্লাবন ঘটে। এই মহাপ্লাবনে দুনিয়ার সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। কেউ জীবিত ছিল না। শুধু নুহের নৌকায় আরোহণ করেছিলেন ৮০ জন নুহ (আঃ) এর অনুসারী; পরবর্তীতে এই ৮০ জন নর-নারী থেকেই মানব জাতির আবার নতুন যাত্রা শুরু হয়। এই নতুন যাত্রায় বাঙালি জাতিরও সম্পর্ক ছিল। বেঁচে যাওয়া ৮০ জনের মধ্যে ছিলেন নুহ (আঃ) এর এক পুত্র; নাম তাঁর 'হাম'। নুহ (আঃ) তাঁর পুত্র 'হাম'কে বললেন, 'তুমি মানব বসতি স্থাপনের জন্যে চলে যাও পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে'। পিতার নির্দেশ পেয়ে 'হাম' চলে এলেন আমাদের এশিয়া মহাদেশের কাছাকাছি। সেখানে এসে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'হিন্দ'কে পাঠালেন ইন্ডিয়ার দিকে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, হামের পুত্র হিন্দের নাম অনুসারেই ইন্ডিয়ার নাম হয়েছে হিন্দুস্তান। আর হামের দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল 'বঙ' বা 'বঙ্গ'। এই 'বঙ' বা 'বঙ্গ'- এর সন্তানরাই বাঙালি বলে পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করে।" নূহ (আ.)-এর পৌত্র বা নাতির নামানুসারে 'বঙ্গ' বা 'বাংলাদেশ'। ঐতিহাসিকদের মতে 'বঙ' বা 'বঙ্গ' যে এলাকায় শাসন করতেন সে অঞ্চলটি ছিল জলাভূমি। তাঁদের কৃষিকাজের সুবিধার জন্য জমির চারপাশে উঁচু আল বেঁধে পানি সরানো হতো। 'বঙ' বা 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে আল যুক্ত হয়ে 'বাঙাল' বা বঙ্গাল শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। সম্রাট আকবরের অন্যতম সভাষদ আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও এই তথ্য সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, এদেশের প্রাচীন নাম 'বঙ্গ'। এদেশের জমিতে উঁচু 'আল' বাঁধা হতো। 'বঙ্গ' এবং 'আল' এ দুটি শব্দ যোগে 'বাঙ্গাল' এবং পরবর্তীকালে 'বাঙ্গালা' হয়েছে। কারো কারো মতে 'বঙ্গ'দের আলয় অর্থাৎ 'বঙ্গ' জাতির আবাসভূমি অর্থে 'বঙ্গাল' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। আবার 'বঙ্গ' নামকরণের পেছনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পৌরাণিক কাহিনীও আছে। ঋষি ব্যাসদেব রচিত মহাভারত অনুযায়ী বঙ্গের নাম এসেছে রাজা বালির পুত্রের নাম থেকে। যাইহোক, আমরা যুক্তরাজ্যে 'Bengal Research Centre' প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের গবেষক দল এসব নিয়ে গবেষণা করছে।

শামসুল ইসলাম: বাঙালি'র সংজ্ঞা কী? 'বাঙ্গালাহ' নামের উৎপত্তি কোথা থেকে হলো? বাঙ্গালী নামের উৎপত্তি কোথা থেকে হলো? এখানকার অধিবাসীদেরকে কখন থেকে বাঙ্গালী নামে অভিহিত করা শুরু হলো?

হাসনাত আরিয়ান খান: শতাধিক বছর আগে জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' গ্রন্থে, বাঙালি'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন- "বাঙ্গালী বলিলে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে যে কোন অধিবাসী, জন্ম ও সংস্কারগত সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশ যাহার স্বদেশ এবং বাঙ্গালা ভাষা যাহার মাতৃভাষা এরুপ ব্যক্তিকে বুঝায়। বঙ্গের অধিবাসীর 'বাঙ্গালী' নাম মুসলমান রাজত্বকালে প্রচলিত হয়। সেন বংশীয় রাজাদিগের আমলে তৎপূর্বে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও গৌড়ীয় প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতো।" হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত নদীময় ভূমি 'গ্রেট বেঙ্গল' নামে সারা বিশ্বে পরিচিত। প্রাচীন যুগে এই 'বৃহত্তর বাংলা' খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত ছিলো। এবং প্রত্যেক খণ্ডই স্বাধীন ছিলো। মধ্যযুগে ১৩৪২-৫২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ দিল্লি থেকে স্বাধীন হয়ে এই সমগ্র খণ্ডগুলোকে একসাথে যুক্ত করে 'বাঙ্গালাহ' নাম দিয়ে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা সালতানাত গঠন করেন। ইলিয়াস শাহ 'বঙ্গ' এর ইতিহাস জানতেন। 'বঙ্গ' থেকেই তিনি তাঁর সালতানাতের 'বাঙ্গালাহ' নাম দেন। তিনি 'বঙ্গ' নাম পুন:প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে বাঙ্গালী বলে অভিহিত করেন। সেই থেকে বাঙালি নামের রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী পরিচয় লাভ করে। ফলে বাংলার আপামর জনগণ অভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক ও ভাষার অঙ্গনে সমবেত হয়। শামস-ই-সিরাজ আফিফ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'কে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' ও 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেন। 'বাঙ্গালাহ' স্বাধীনতা হারায় দিল্লি'র সম্রাট আকবরের আমলে ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার সুলতান দাউদ খান কাররানীর পরাজয়ের ফলে। আকবরের প্রধানমন্ত্রী ও ঐতিহাসিক শেখ আবুল ফজল ইবন মুবারক তাঁর বিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরী' বইয়ে বাংলার যে সীমানা উল্লেখ করেছেন তাঁর বর্ণনা অনুসারে, 'সুবা বাংলা পূর্বে চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে হুগলি জেলার মান্দারন পর্যন্ত ২০০ ক্রোশব্যাপী বিস্তৃত ছিল।' ব্রিটিশরা প্রায় দুইশো বছর উপমহাদেশ শাসন করলেও এ জনপদের নাম 'বেঙ্গল'ই রেখেছিলো।

সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন সুরমা'র সিনিয়র রিপোর্টার শামসুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: আপনারা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলছেন। বিশুদ্ধ বর্মি জাতীয়তাবাদের চেতনা থেকে মিয়ানমার যেভাবে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেয়নি, সেভাবেই বিশুদ্ধ আর্য জাতি গঠনের প্রচেষ্টা নাৎসি জার্মানি করেছিল। বহিরাগত অভিযোগ তুলে আইন করে জার্মানিতে ইহুদিদের নাগরিকত্ব ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদ তো খুব খারাপ জিনিস। আপনারা কি উগ্র জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: যেকোনো রাজনৈতিক মতবাদের সুফল ও কুফল আছে। যারা সেই রাজনৈতিক মতবাদের চর্চা করেন তারা কিভাবে তা ব্যবহার করেন তার উপর নিভ্রর করে গণমানুবের উপর সেই মতবাদের ফলাফল। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ, জাতিগত জাতীয়তাবাদ, সম্প্রদায়গত জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন রকম জাতীয়তাবাদ হতে পারে। জাতীয়তাবাদকে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম এই দুই ভাগে ভাগও করা যেতে পারে। এছাড়াও জাতীয়তাবাদকে আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক এই দুইভাবেও দেখা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ইন্ডিয়ার কথা বলা যেতে পারে। বর্তমান সময়ে ইন্ডিয়ার কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার হিন্দি ভাষা ও হিন্দু ধর্মকেন্দ্রীক উগ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ও কৃত্রিম এই জাতীয়তাবাদের কুফল রাষ্ট্রের ভিন্ন ধর্মীয় ও ভিন্ন ভাষিক মানুষেরা ভোগ করছে। যাইহোক, আমরা উগ্র জাতীয়তাবাদের কথা বলছি না। উগ্র জাতীয়তাবাদ অবশ্যই খুব খারাপ জিনিস। যেটা আমরা হিটলারের জার্মানিতে দেখেছি। জান্তার মিয়ানমারে দেখছি। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ জার্মান ও মিয়ানমারের জাতীয়তাবাদের মতো 'Racial' নয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ হচ্ছে 'Lingual'। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বর্ণবাদের কোন স্থান নেই। বাঙালি জাতীয়তাবাদ জার্মান জাতীয়তাবাদের মতো 'Exclusive' নয়, বরং 'Inclusive'। জাতীয়তাবাদের 'Exclusiveness' হচ্ছে রুদ্ধদ্বার নীতি। আর, 'Inclusiveness' হচ্ছে খোলাদ্বার নীতি। 'Exclusive' জাতীয়তাবাদ সাধারণতঃ বর্ণবাদী হয়ে থাকে। কিন্তু 'Inclusive' জাতীয়তাবাদ সহজেই যে কোনো বর্ণের মানুষকে নিজের মধ্যে অন্তর্গত করতে পারে। বাঙালি কোনো বর্ণভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক জাতি নয়। বাঙালি হচ্ছে বহুধর্ম ও বহুবর্ণের একটি ভাষাজনজাতি। বাঙালিই বাংলার ভূমিপুত্রপুত্রী ও আদিবাসী, যারা স্বভাবতই বাংলায় বসবাসরত যেকোনো জাতির সাথে আত্মীকরণের কিংবা সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে শান্তিতে আগ্রহী। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলা-প্রেমিক বিধায়, বাংলায় অভিবাসিত সকল জাতির সাথে তা সমন্বয়বাদী আচরণ করে। তাছাড়া আমরা শুধু ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথাই বলছি না। আমরা একইসাথে বাংলাদেশি জাতীয়তার কথাও বলছি। আমাদের সংবিধানেও এই দুই কথাই বলা হয়েছে। 'Inclusive' জাতীয়তাবাদের কারণে বাঙালি ও বাংলাদেশিরা সকল ধর্ম, সকল বর্ণ ও সকল জাতির প্রতি সবাই সমান সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল। আপনি বাঙালির Political identity'র কথা যদি বলেন, বাঙালির Political identity''র প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' ও দ্বিতীয় আলেকজান্ডারখ্যাত শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র প্রধান সেনাপতি ছিলেন একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী, হিন্দু। তাঁর নাম ছিলো বীর সহদেব। ইলিয়াস শাহ সকল ধর্মের সকল বর্ণের ও সকল মতের মানুষকে নিয়ে গৌরবোজ্জ্বল অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনি এই অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে বাঙালি বলে অভিহিত করেন। বাংলার সাংস্কৃতিক আবহ ও জ্ঞানগত উৎকর্ষের কারণে বহু পরিব্রাজক ও পণ্ডিত এখানে ভ্রমণ করেন। বাংলা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ দেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেন। বস্তুত, উদার নীতি গ্রহণ করে তিনি জনগণের মধ্যে সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে বাঙালি সমাজে এক নতুন জীবনধারার সূচনা করেন। দিল্লি'র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে নিজেকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ ভাষাগত জনজাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এভাবে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার স্বাধীন সালতানাতকে সুদৃঢ় করেন। রাজনৈতিকভাবে আমরা এক জাতি। আমাদের মধ্যে ভাষাগত মিল আছে। আমরা একটি ভাষাগত জনজাতি। আমাদের মধ্যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা আছে। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হয়েছে। এক খণ্ড হলেও 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের আন্দোলনের সুবিধা। আশাকরি বুঝতে পেরেছেন।

শামসুল ইসলাম: আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ দেশের তরুণেরা বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে জীবন দিয়ে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, সেটা কতটা পূরণ হয়েছে?

হাসনাত আরিয়ান খান: একুশে ফেব্রুয়ারির দাবি ছিল বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার। সে দাবি অর্জিত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই পুর্ববঙ্গ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলাদেশে বাংলা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। কিন্তু সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হয়নি। এখনো আমরা সর্বস্তরে আমাদের মাতৃ ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। মাতৃভাষাকে এখনো আমরা সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন করতে পারিনি। স্বাধীনতার পর ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, সেই কমিশন প্রাথমিক স্তরে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছিল। বাস্তবে সেটা হয়নি। প্রাথমিক স্তরে চতুর্মুখী শিক্ষা চালু রয়েছে। বিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসাবিদ্যাসহ উচ্চশিক্ষার অনেক বিষয়ে বাংলায় পড়ানো হয় না। অজুহাত দেখানো হয়ড়বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় বই নেই। এর অর্থ নিজ নিজ ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বাংলা ভাষার চর্চা ও অনুবাদে মনোযোগ দেননি, রাষ্ট্রও এগিয়ে আসেনি। উপরন্তু স্বাধীনতার ৫৪ বছরে রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের যতদূর এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিলো, আমরা ততদুর যেতে পারিনি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন কেবল ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল না; এটি ছিল একটি জাতিগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার মহৎ সংগ্রাম। আমরা এখনো নিজেদের আত্মপরিচয় সেভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। জাতি এগোলে ভাষা এগোয়। ভাষার সম্মান বাড়ে। এছাড়া ভাষার একটা বাণিজ্যিক মূল্য আছে। যে দেশ পৃথিবীতে যত এগোবে মানুষ সে দেশের ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়বে। যে দেশ পৃথিবীতে অর্থনৈতিক নেতৃত্ব দিবে, মানুষ সে দেশের ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়বে, সে ভাষা যত জটিলই হোক না কেন, এটাই নিয়ম। আমাদেরকে জাতিগতভাবে এগোতে হবে। পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার কথা ভাবতে হবে। একইসাথে দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। আমরা যদি ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই, তাহলে শহিদ দিবসকে আনুষ্ঠানিকতায় সীমিত না রেখে এর মর্ম উপলব্ধি করতে হবে। দুঃখের বিষয়, শুধু ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি মাস এলেই সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার ব্যাপারে সোচ্চার হয় সরকার, বছরের বাকি সময় থাকে উদাসীন, অনুভূতিহীন! ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি এলে ভাষাচর্চার কথা বলা আর বছরের অন্য মাসে ভুলে থাকা, এটা ঠিক নয়।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: আপনারা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র বাংলা ফেরত চাইছেন, সিরাজ-উদ-দৌলা'র বাংলা ফেরত চাইছেন। আপনাদের বিরোধীরা বিশেষ করে দিল্লি'র শাসক দল 'বিজেপি' ও 'আরএসএস' এর সদস্যরা বলছেন, শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও সিরাজ-উদ-দৌলা এই দু'জনের কেউ-ই বাঙালি ছিলেন না। তাঁরা অনেক ঐতিহাসিক রেফারেন্স দিচ্ছেন। উত্তরে কী বলবেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: ঐতিহাসিক যে রেফারেন্স তাঁরা দিচ্ছেন এগুলোর একটাও সত্যিকারের ইতিহাস না। এগুলো হচ্ছে ইংরেজদের লেখা ইতিহাস। এগুলো হচ্ছে ফ্রান্সিস বুকানন, চার্লস স্টুয়ার্ট আর মার্শম্যান'দের লেখা বাংলার চটুল ইতিহাস। এগুলো বাংলার প্রকৃত ইতিহাস নয়। অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান শাহ-ই-বাঙ্গালাহ খ্যাত শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা এই দু'জনেই বাঙালি ছিলেন। তাঁরা দু'জনই বাংলা মায়ের সন্তান ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র পূর্বপুরুষ ১২২৭ শতাব্দীতে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। অতীতে যারা 'Migrant' বা 'অভিবাসী' হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন তাঁরা মূলত পুরুষ ছিলেন। এই অভিবাসী পুরুষেরা স্থানীয় বাঙালি নারীদের বিয়ে করে এখানেই সংসার পেতেছিলেন। এখানেই স্থায়ী আবাস গড়েছিলেন। সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছিলেন। দেশের জন্য লড়াই করেছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই মাটিতেই ছিলেন এবং মৃত্যুর পরে তাঁরা এই মাটিতেই মিশে গিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষও এভাবেই ইরাক থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র পূর্বপুরুষও এর ব্যাতিক্রম ছিলেন না। তবে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র পূর্বপুরুষ সিস্তান থেকে এলেও তাঁর বাবা মুহাম্মদ আবদুল রহমান খান বাঙালি মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সোনারগাঁও মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। শৈশবে ইলিয়াস শাহ তাঁর বাবার সাথে হজ করেছিলেন বলে সেই সময় তিনি সবার কাছে হাজি ইলিয়াস খান নামে পরিচিত ছিলেন। ইলিয়াস শাহ'র মা পূর্ব বঙ্গের এক বৌদ্ধ রাজার কন্যা ছিলেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইলিয়াস শাহ'র স্ত্রী সুলতানা ফুলওয়ারা বেগম বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনীর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি পুষ্পবতী ভট্টাচার্য নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় স্বাধীন সুলতান সিকান্দার শাহ'র মা এবং ইলিয়াস শাহর সংগ্রামময় ও সাফল্যমণ্ডিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের অংশীদার ছিলেন। যেহেতু তিনি বাঙালি ছিলেন, সেহেতু সমগ্র বাংলা অঞ্চলকে একত্রীকরণ করে তিনি 'বাঙ্গালাহ' নামে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর অধিবাসীদেরকে তিনি বাঙালি বলে অভিহিত করেছিলেন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন। বাঙালি নামে যে আলাদা কোন জাতি আছে, তাদের আলাদা ভাষা আছে, জাতি রাষ্ট্র আছে, একথা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ 'বাঙ্গালাহ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে কেউ-ই জানতেন না। কারণ তৎকালীন বাংলার শাসকরা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতেন না। তারা সাহিত্য ও রাষ্ট্র ভাষায় বাংলাকে প্রাধান্য দিতেন না। তারা সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। সংস্কৃতে নির্দেশ জারি করতেন, 'যারা বাংলা ভাষা বলবে ও শুনবে তারা রৌরব নামক নরকে যাবে।' বাংলায় আরও কয়েক শতকের জন্য যদি ইলিয়াস শাহ'র পূর্বের এসব শাসকের শাসন অব্যাহত থাকত, তবে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত-প্রায় হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো। বাংলা'র শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা'র ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। তাঁর পূর্বপুরুষেরাও প্রায় একইভাবে 'Migrant' বা 'অভিবাসী' হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এবং বাংলাদেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা'র পূর্বপুরুষেরা লুটেরা ছিলেন না। তাঁরা বর্গীদের মত বাংলায় হানা দেয়নি। তাঁরা ব্রিটিশদের মত বাংলার সম্পদ লুট করে চলে যায়নি। সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মসূত্রেই তিনি বাঙালি ছিলেন। যৌবনে তিনি ঢাকায় নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন। নবাব হবার পর তিনি তাঁর গোটা সাম্রাজ্যের নাম 'বঙ্গ' রেখেছিলেন। এ মাটির সন্তান না হলে তিনি অন্য কোন নাম রাখতেন। তিনি দেশপ্রেমের একজন সত্যিকারের সার্থক প্রতিকৃতি ছিলেন। এ দেশের মাটির সঙ্গে বেইমানি করেননি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাই ব্রিটিশ বেনিয়াদের গ্রাস থেকে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কার্পণ্য করেননি। ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বাণিজ্যে তিনি কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে, মুখ বুজে ঔদ্ধত্য সহ্য করে নবাবী আগলে থেকে যেতে পারতেন আমৃত্যু। কিন্তু তার কোনটাই তিনি করেননি। তিনি একাধারে ছিলেন 'নিখাদ দেশপ্রেমিক', 'অসীম সাহসী যোদ্ধা', 'সব বিপদে পরম ধৈর্যশীল', 'কঠোর নীতিবাদী', 'নিষ্ঠাবান' এবং 'যে কোনো পরিণামের ঝুঁকি নিয়েও ওয়াদা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব'। চরম বিপদের মুহূর্তেও কারোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি আবার কারো প্রতি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাও নেননি। এসবই ছিল নবাবের উদারতা। ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা বাংলার মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। নবাব হিসেবে তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শাহাদত বরণ করে নিজের নাম ইতিহাসে চিরস্থায়ী করে গেছেন। অথচ অসাধু কিছু ঐতিহাসিক সামান্যতম আনুকূল্য লাভের আশায় নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা'র ব্যক্তিগত জীবন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে লাগাতার মিথ্যা ও বানোয়াট গল্প বুনে তা প্রচারের আলোয় আনার অপচেষ্টা করে গেছেন এবং সে সব বিকৃত ইতিহাসের ধারা বহমান।

শামসুল ইসলাম: আপনি সীমান্ত হত্যার কথা বলেছেন। ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সবসময়ই একটা কমন কথা বলা হয়, 'এরা চোরাকারবারি' অথবা 'এরা গরুচোর'। নিহত সব বাংলাদেশিকে অপরাধী মনে করে তারা। এব্যাপারে কী বলবেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: মাত্র ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী কিশোরী স্বর্ণা দাস ও ফেলানী খাতুন কিভাবে 'চোরাকারবারি' অথবা 'গরুচোর' হয়? গরুর জন্ম কি সীমান্তে হয়? তাছাড়া 'গরুচোর' হলেই কি কোন মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করা যায়? 'চোরাকারবারি' হলে আইন আছে, আদালত আছে, বিচার ব্যবস্থা আছে। সরাসরি গুলি করার অধিকার 'বিএসএফ'কে কে দিয়েছে? শুধু কিশোরী ফেলানী বা স্বর্ণা নয়, ইন্ডিয়ান সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিয়মিত বাংলাদেশের মানুষকে সীমান্তে গুলি করে হত্যা করছে। কোন হত্যাকান্ডেরই তদন্ত হয়নি, বিচার হয়নি। সীমান্ত হত্যার বিচার হয় না। এ রকম দুই দেশের সীমান্তে একটি দেশ কর্তৃক নিয়মিতভাবে অন্য দেশের নাগরিককে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া সীমান্ত ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। আমরা খবরের কাগজে দেখি, 'বিএসএফ' এর গুলিতে ধান কাটতে গিয়ে কৃষক মারা গেছে। মাছ ধরতে গিয়ে জেলে মারা গেছে। এর দায়ভার কে নিবে? আন্তর্জাতিক কোনো আইনেই নিরস্ত্র নাগরিককে গুলি করে মেরে ফেলার কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও তারা কিভাবে নিরস্ত্র বাংলাদেশি নাগরিকদের গুলি করে মেরে ফেলে? ইন্ডিয়া সীমান্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বীকৃত সকল আন্তর্জাতিক ও দ্বিপক্ষীয় প্রটোকল অগ্রাহ্য করে কিভাবে সীমান্ত হত্যাকাণ্ড ঘটায়?

(বাকি অংশ ৮নং পাতায়)

ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি এলে ভাষাচর্চার কথা বলা আর বছরের অন্য মাসে ভুলে থাকা, এটা ঠিক নয়ঃ হাসনাত আরিয়ান খান

(৪নং পাতার পর)

এই সাহস তারা কোথায় পায়? ইন্ডিয়ান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের 'নিরাপত্তার জন্য হুমকি' নামক আরেকটা গল্প ফাঁদা হয়। মাত্র ১৫ বছর বয়সী কিশোরী ফেলানী কুড়িগ্রামের অনন্তপুর সীমান্ত দিয়ে তার বাবার সঙ্গে ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে ফিরছিলো। কাঁটাতার পার হওয়ার সময় তাকে গুলি করে হত্যা করে বিএসএফ। মায়ের সঙ্গে ত্রিপুরায় থাকা ভাইকে দেখতে যাওয়ার সময় মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্ত এলাকায় ১৪ বছর বয়সী কিশোরী স্বর্ণা দাসকে গুলি করে হত্যা করে বিএসএফ। বাবার হাত ধরে সীমান্ত পাড়ি দিতে চাওয়া নিরস্ত্র কিশোরী ফেলানী খাতুন কিংবা মায়ের হাত ধরে সীমান্ত পাড়ি দিতে চাওয়া নিরস্ত্র কিশোরী স্বর্ণা দাস কী করে অস্ত্রধারী বিএসএফের জন্য হুমকি হতে পারে? মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চের তরফেই আমরা জানতে পারি, সীমান্ত হত্যার পেছনে যে গল্প ফাঁদা হয়, তা সঠিক নয়। এমনকি বিএসএফের আত্মরক্ষার অজুহাতগুলোও গ্রহণযোগ্য নয়। তারা কোনো নিয়মকানুন মানে না। তারা কোন প্রটোকলই মানে না। সীমান্তে ইন্ডিয়া যে আচরণ করে এ আচরণ আধিপত্যবাদী আচরণ, এ আচরণ আগ্রাসনমূলক আচরণ। এ আচরণ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য না। ইন্ডিয়া ব্রিটিশদের সহায়তায় আমাদের অঞ্চলগুলো দখলে নিয়ে নতুন সীমানা বানিয়ে কাঁটাতার দিয়ে আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। অথচ এ অঞ্চলগুলোতে বাঙালি ও কাছাকাছি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করেন। সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও আরো অনেক রকম যোগাযোগ। যেকারণে সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের এপার থেকে ওপারে যেতে হয়। দিল্লিতে বাঙালি ও কাছাকাছি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা বসবাস করেন না। কাজেই ইন্ডিয়া তার সীমানা আগের জায়গায় অর্থাৎ বিহারের কুশি নদীর তীর পর্যন্ত ফিরিয়ে নিলে বাংলাদেশের মানুষকে দিল্লি যেতে হবে না। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তাদেরকে সংযত আচরণ করতে হবে। সীমান্তে গুলি করে মানুষ মারা বন্ধ করতে হবে। সীমান্তে বিএসএফের গুলি বন্ধে ইন্ডিয়ান কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে হবে। নিজেদের অধিকার ও স্বার্থের ব্যাপারে বাংলাদেশকে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। সীমান্ত হত্যা বন্ধে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে হবে।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামানঃ বাংলাদেশিদের নিয়ে ইন্ডিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও শিষ্টাচার বহির্ভূত বক্তব্যের কড়া প্রতিবাদ করেছে 'অখন্ড বাংলাদেশ আন্দোলন'। আপনারা ইন্ডিয়ার শাসকদেরকে তাদের দেশের সীমানা বিহারের কুশি নদীর তীর পর্যন্ত ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। বলেছেন, ঝাড়খন্ডে বাংলাদেশিরা নয়, নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ'দেরই অনুপ্রবেশকারী। একটু খুলে বলবেন কী?

হাসনাত আরিয়ান খানঃ আপনারা জানেন ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঝাড়খণ্ডে এক দলীয় জনসভায় বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশকারী উল্লেখ করে 'উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করে দেওয়ার' যে হুমকি দিয়েছেন, 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর পক্ষ থেকে আমরা তার তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ ও চরম অসন্তোষ জানিয়েছি। এই প্রথমবার নয়, অমিত শাহ এর আগেও বাঙালি ও বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করেছেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী অন্তত দুইবার তিনি বাংলাদেশিদের 'অনুপ্রবেশকারী উইপোকা' বলেছেন, একবার তিনি 'বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া'র কথা বলেছেন। ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে অমিত শাহ'র একটি জনসভার ভাষণের ভিডিওতে দেখা গেছে, তিনি একাধিকবার রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন, "ঝাড়খণ্ডের একবার সরকার বদল করুন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, ঝাড়খণ্ড থেকে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে খুঁজে বের করে ঝাড়খণ্ড থেকে তাড়ানোর কাজটি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। তারা আমাদের সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা আমাদের সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে। তারা আমাদের রোজগারপত্রও লুঠ করছে। ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশকারীদের কোনও জায়গা নেই, একমাত্র বিজেপি সরকারই এটা করতে পারে। আমি আজ বলে যাচ্ছি, আপনারা এখানে পদ্ম ফুলের সরকার বানান, এইসব অনুপ্রবেশকারীদের উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করার কাজটা আমরা করব।" শুধু যে অমিত শাহ এ ধরণের অশোভন, আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য মন্তব্য করেছেন, তা নয়। নরেন্দ্র মোদিসহ বিজেপির অন্যান্য নেতাদের মুখেও এ ধরনের বাজে মন্তব্য শোনা গেছে। যা চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও শিষ্টাচার বহির্ভূত। ইন্ডিয়ার ক্ষমতাসীন দল ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের মুখে এধরনের কুৎসিত, অশালীন বক্তব্য কাম্য নয়। তাই আমরা এমন অশোভন, কুৎসিত, আপত্তিকর, অগ্রহণযোগ্য বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছি। প্রতিবাদলিপিতে আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি, "ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, বিহার, উড়িষ্যা, আন্দামান এবং ছত্তিশগড়ের কিছু অংশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ গংরাই অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশিরা নয়, বাঙালিরা নয়। বাঙালিরা এ অঞ্চলের ভূমিপুত্র। সমগ্র বাংলা বলয়ের মাটি বাঙালিদের পূর্বপুরুষদের মাটি। বাঙালিদের রয়েছে এখানে থাকার নিঃশর্ত অধিকার। কেন্দ্রীয় বাংলা বলতে আজ বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ বোঝালেও প্রান্তিক বাংলা- ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, বিহার, উড়িষ্যা, আন্দামান, সেভেন সিস্টার্স এবং ছত্তিশগড়ের কিছু অংশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পুরো অঞ্চলেই বাঙালি এবং বাঙালিদের কাছাকাছি নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করেন। এ আমাদের সুলতানি বাংলা, এ আমাদের নবাবি বাংলা, শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র বাংলা, সিরাজ-উদ-দৌলা'র বাংলা। এ আমাদের সুবা বাংলা, বাংলা সালতানাতের ভূমি। বস্তুত বাঙালি এবং বাংলা বলয় চেতনে-অবচেতনে বিজেপির কাছে আতঙ্কজনক এক প্রতিপক্ষ। কাজেই ইন্ডিয়া জুড়ে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, শতধা ছিন্নভিন্ন এই বাঙালিকে হীন করতে, কোণঠাসা করতে তারা মরিয়া। তারা চায় বাংলা বলয়ের ভূমির দখল, তারা চায় বাংলা বলয়ের মেরুদণ্ড বাঙালিদের উৎখাত করতে। এজন্যই আমরা তাদের সীমানা বিহারের কুশি নদীর তীর পর্যন্ত ফিরিয়ে নিতে বলেছি। এর কারণ ১৩৫৩ সালের নভেম্বরে বিহারের কুশি নদীর তীরে দুই দেশের সীমান্তে দিল্লি'র সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলকের সাথে অবিভক্ত বাংলার প্রথম সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ'র একটি শান্তি চুক্তি হয়েছিলো। দুই দেশের সীমানা নির্ধারণী সেই চুক্তিতে বলা হয়েছিলো, বাংলা কখনো দিল্লি আক্রমণ করবে না, দিল্লি কখনো বাংলা আক্রমণ করবে না। আমরা সেই চুক্তির কথা নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ গংদের মনে করিয়ে দিয়েছি।

শামসুল ইসলামঃ আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী দূতাবাসে হামলার প্রতিবাদে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী বলেছেন, 'ইন্ডিয়া যদি এইভাবে একের পর এক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী মনোভাব দেখায় তাহলে আমরা আমাদের নবাবের এলাকা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দাবি করবো। আমরা হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে লড়াই করব। আমরা এখানে যারা আছি তাঁরা সিরাজ-উদ-দৌলা, মোহনলাল, মীর মদনের উত্তরসূরি। ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা লড়বো।' আপনারা রুহুল কবীর রিজভী'র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দাবি সম্বলিত বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে কিছু বলেছেন?

হাসনাত আরিয়ান খানঃ 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকেও এই দাবিতে সোচ্চার হওয়ার আহবান জানিয়েছি। "ভারত নামে কোন এনটিটি নাই। "ভারত" নামে পৃথিবীতে কোন দেশ নাই। "ইন্ডিয়া" নামে একটা দেশ আছে। "ইন্ডিয়া" জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র। বাংলাদেশও জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় স্ট্যাটাসের দিক দিয়ে দুই দেশই সমান। অথচ "ভারত" নামক যে দেশের কোন অস্তিত্বই পৃথিবীতে নাই, সেই দেশের নামের আগে "মহান" যুক্ত করে দিল্লি'র শাসকেরা বাংলাদেশ ও আশেপাশের প্রতিবেশি দেশগুলোর উপর আধিপত্য দেখাচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্ব দেখাচ্ছে, হেজিমনি ফলাচ্ছে! বাংলাদেশের দূতাবাসে হামলা করে ভাঙচুর চালাচ্ছে, দেশের পতাকা পুড়াচ্ছে। যা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য না। ইন্ডিয়ার উগ্রবাদী বিজেপি সরকারের 'আরএসএস' এর পান্ডারা বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে যে নজিরবিহীন হামলা করেছে তা বাংলাদেশের উপর হামলা। হাইকমিশনের ভেতরে হামলা, ভাঙচুর এবং বাংলাদেশের পতাকার অবমাননা 'ভিয়েনা কনভেনশন'র সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এর জন্য ইন্ডিয়াকে আমরা বাংলাদেশের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে বলেছি। পাশাপাশি বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং সেখানে বসবাসরত বাঙালি ও বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলেছি। ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে লন্ডনে ইন্ডিয়ান হাইকমিশনের সামনে আমরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছি। সেই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আমরা ইন্ডিয়ার সরকারের কাছে ১০ দফা দাবি পেশ করেছি। ইন্ডিয়ার জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছি, "আপনাদের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই, বিরোধ নেই। আপনাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব আছে। আপনাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে। আপনাদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা আছে। আমাদের মত আপনারাও দিল্লি'র শাসকদের যাতাকলে নিস্পেষিত। আমাদের মত আপনারাও দিল্লি'র শাসকদের শাসন, ত্রাসন ও সংহারে বিপর্যস্ত। আমাদের এই বিরোধীতা শুধুমাত্র দিল্লি'র শাসকদের বিরোধীতা। আমাদের বিরোধীতা দিল্লি'র বাংলাদেশ নীতির বিরোধীতা। আমরা দিল্লিকে না বলেছি। আপনারাও না বলুন। পান্জাব, কাশ্মীরকে দিল্লি'র অধীনস্থ থেকে মুক্ত করুন। 'অখণ্ড বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করুন। নতুন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি দিল্লি'র শাসকদের শ্রদ্ধাশীল হতে বলুন। বাংলাদেশ হাইকমিশনে হামলার ঘটনায় যেসব রাজনৈতিক দল ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিবাদ করেনি, তাদেরকে বয়কট করুন।"

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামানঃ আন্দামানের সেলুলার জেলের পুনর্নবীকরণের কাজ করে ভিনায়ক দামোদর সাভারকারের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়া নতুন নাম ফলক থেকে চার শতাধিক বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম মুছে ফেলা হয়েছে। ইতিহাস বদলে ফেলতে চাওয়ার এই প্রচেষ্টায় বহু মানুষ সরব হয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের নাম এইভাবে বাদ দেওয়ার কারণ কী বলে মনে করেন?

হাসনাত আরিয়ান খানঃ যে কথা আগেই বলেছি যে, 'বাঙালি এবং বাংলা বলয় চেতনে-অবচেতনে বিজেপির কাছে আতঙ্কজনক এক প্রতিপক্ষ। কাজেই ইন্ডিয়া জুড়ে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, শতধা ছিন্নভিন্ন এই বাঙালিকে হীন করতে, কোণঠাসা করতে তারা মরিয়া। তারা চায় বাংলা বলয়ের ভূমির দখল, তারা চায় বাংলা বলয়ের মেরুদণ্ড বাঙালিদের উৎখাত করতে।' আন্দামানের নতুন ফলকগুলিতে রয়েছে মাত্র ৫১৩ জন বিপ্লবীর নাম। রমেশচন্দ্র মজুমদারের বই অনুযায়ী সেখানে ৯৬৬ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামের তালিকা ছিল। নামের আদ্যাক্ষর দিয়েই তালিকাটি সাজানো হয়েছিল। আন্দামানের সেলুলার জেল একসময় বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ঠিকানা হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৬ সালে এই জেল নির্মাণের কাজ শুরু হলেও সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকেই আন্দামানকে ব্রিটিশ শাসকরা বন্দিখানা হিসাবে ব্যবহার করছিলো। সব জায়গা থেকেই সেলুলার জেলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দি করা হত। কিন্তু বাংলা, বিহার এবং আন্দামানের বিচার ব্যবস্থা অনেকটাই কলকাতা হাইকোর্টের ওপরে নির্ভরশীল ছিল। ফলে বাঙালিদের এই জেলে দ্বীপান্তর করার প্রবণতাও সেই সূত্রেই বেশি ছিল। সেখানে প্রায় ছ'শো-সাতশো'র মতো বাঙালি বিপ্লবীদের নাম ছিল। এই নাম ফলক বদলে কাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, সেটা নিয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আরও একটি বিষয় হল, সেই পুরনো তালিকায় প্রত্যেক বিপ্লবীদের নামের পাশে তাঁরা কত সালে এই জেলে বন্দি হয়ে এসেছিলেন সেই তারিখ উল্লেখিত ছিল। নতুন তালিকায় এই ধরণের কোনো তারিখ উল্লেখ নেই। বরং ১৯০৯-১৯২১, ১৯২২-১৯৩১ এবং ১৯৩২-১৯৩৮ সাল; এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে পুরো সময়সীমাকে। বাদ দেয়া হয়েছে ১৯০৯ সালের আগের বিপ্লবীদের নামও। 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' আন্দামান শাখার সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে এমন তথ্যই জানা গেছে। বদল হওয়া নতুন তালিকাতে প্রথমেই ভিনায়ক দামোদর সাভারকারের নাম রয়েছে। যিনি কিনা আন্দামান জেলে থাকার সময় ব্রিটিশ সরকারের কাছে একাধিকবার ক্ষমা ভিক্ষা করে আবেদন জানিয়েছিলেন। সেলুলার জেল থেকে মুক্তির জন্য ১৯১১ থেকে ১৯২০ এর মধ্যে তিনি অন্তত সাতবার আবেদন জানিয়েছিলেন। ভিনায়ক দামোদর সাভারকারের জীবনীগ্রন্থের লেখক ভিক্রম সামপাথ লিখেছেন, সাভারকার ১৯২০ সালে যে আবেদন করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন 'সংবিধান মেনে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে তিনি রাজি আছেন এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য রাজনৈতিক কোন কার্যক্রমে তিনি জড়িত থাকবেন না।' ১৯২৪ সালে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন এবং জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আন্দোলন তো দুরের কথা, তিনি ব্রিটিশ শাসনের সামান্য সমালোচনাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগীতা করছিলেন। ভিনায়ক দামোদর সাভারকার হিটলারের নাৎসিবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন। 'হিন্দু রাষ্ট্রের' জন্য তিনি সালিশী করেছিলেন। ইন্ডিয়ায় কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি'র মতাদর্শের মূল ভিত হল হিন্দুত্ব। ফলে বিজেপির চোখে উগ্রবাদী সাভারকার এখন একজন অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসেবে ধরা দিয়েছেন। আর তাই ভিনায়ক দামোদর সাভারকারের নামে সেলুলার জেলের নামকরণ করা হয়েছে। এবং বদল হওয়া নতুন তালিকাতেও প্রথমেই ভিনায়ক দামোদর সাভারকারের নাম রাখা রয়েছে। নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার ইতিহাস বিকৃত করেছে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রুপকার হলো বাঙালি জাতি। সেই বাঙালি বিপ্লবীদের নাম বাদ দেওয়ায় আন্দামানে হিন্দি আগ্রাসনের সম্ভাবনাও দেখা দিচ্ছে। ভিনায়ক দামোদর সাভারকারের নামে সেলুলার জেলের নামকরণের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার প্রকৃত বিপ্লবীদের বিশেষ করে বাঙালি বিপ্লবীদের অসন্মান করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।

শামসুল ইসলামঃ সম্প্রতি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন পোর্টালের সাংবাদিক ও সম্পাদকদের আপনারা 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার না করতে অনুরোধ করেছেন। এছাড়া আপনারা আপনাদের দাবিকৃত রাজ্যগুলোর আগে ভারতের রাজ্য না লিখতে অনুরোধ করেছেন। কেনো করেছেন?

হাসনাত আরিয়ান খানঃ 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার না করার অনুরোধ শুধু 'অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন' এর পক্ষ থেকেই করা হয়নি। অতীতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার না করার অনুরোধ করা হয়েছে। ২০১১ সালে ঢাকায় বিদেশী কূটনীতিকদেরও এ বিষয়ে ব্রিফ করা হয়েছে। কারণ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন পোর্টালে আদিবাসী যাদের বলা হচ্ছে তারা এখানকার আদিবাসী বা আদি বাসিন্দা নয়। আদিবাসী হতে হলে কলোনিয়াল কিংবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কলোনাইজেশন হতে হয়। এখানে সে ধরনের কিছুই হয়নি। বাঙালিরাই এখানকার আদিবাসী বা আদি বাসিন্দা। এখানকার বাঙালিদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি চার হাজার বছরের পুরনো। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সেটিই প্রমাণ করে। কাজেই এ নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি না করে গণমাধ্যমের উচিত জাতিগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সাম্য বজায় রেখে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার ভিত্তিতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা। আর দু'টি কারণে ভারতের রাজ্য না লিখতে অনুরোধ করেছি। এক: 'ভারত' নামে পৃথিবীতে কোন দেশ নেই। দুই: যে দেশটাকে ভারত বলা হচ্ছে, আমাদের দাবিকৃত রাজ্যগুলো কোনদিনই সেদেশের ছিলো না। যেমন: পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ লিখলেই হয় বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লিখলেই হয়। তাতে চিনতে কারো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখার প্রয়োজন নেই।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামানঃ দেশে এক শ্রেণির মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে ইন্ডিয়ার সহযোগীতার কথা বলছে, ঋণ শোধের কথা বলছে। অন্যদিকে ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৬ ডিসেম্বরকে ভারতের বিজয় দিবস বলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ দুইকেই অস্বীকার করেছে। ইন্ডিয়া তার আসল রুপ বের করেছে। সামনে হয়তো আরো করবে। তবে কি দ্বিতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধও বাংলাদেশকে লড়তে হবে?

হাসনাত আরিয়ান খানঃ ইন্ডিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী না, সুবিধাভোগী। শত্রু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছিলো ইন্ডিয়ার সুবিধাবাদী সিদ্ধান্ত। সেই যুদ্ধে ইন্ডিয়ার সেনাপতি, বাঙালির 'কথিত মুক্তিদাতা' স্যাম মানেকশ কাশ্মীর ও পান্জাবের স্বাধীনতা ও মুক্তিকামীদের কঠোর হস্তে দমন করেছেন। বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তিকামীদের যিনি বন্ধু তিনি আবার অন্য জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তিকামীদের নির্মমভাবে দমন করেন কিভাবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের শত্রু হন কীভাবে? এমনকি আমাদের বাংলাদেশের অন্যান্য খণ্ড অংশগুলো দখল করে রাখে কিভাবে? সেই অংশের বাঙালিদের সেখান থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয় কিভাবে? সীমান্তে পাখির মত মানুষ হত্যা করে কিভাবে? নেপাল পর্যন্ত করিডোর বন্ধ রাখে কিভাবে? ইন্ডিয়া যখন যা করেছে নিজ স্বার্থে করেছে। যুদ্ধের পর প্রায় লক্ষাধিক পাকিস্তানি সেনা সদস্যের ফেলে যাওয়া সব অস্ত্র, গোলাবারুদ, যানবাহন ও অন্যান্য সামগ্রী এবং বিভিন্ন শিল্প কলকারখানার মেশিন ইত্যাদি ইন্ডিয়ার সেনাবাহিনী নিয়ে গেছে। ইন্ডিয়া তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি এখনো ঝুলিয়ে রেখেছে। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশকে প্রায় মরুভূমিতে পরিণত করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলিকে সুকৌশলে পঙ্গু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের এই স্বাধীন অংশটাকেও তারা এখন গিলে খেতে চাইছে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধকালীন ইন্ডিয়ার কাছে বাংলাদেশের কোন ঋণ নাই, ঋণ শোধের কোনো দায়ও নাই। নরেন্দ্র মোদি'র বক্তব্যে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। নরেন্দ্র মোদিরা প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বরে আমাদের মহান স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বলে দাবি করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা ও লক্ষ শহিদের আত্মদানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয় প্রতিপন্ন করে যাচ্ছে। অথচ বাস্তবতা হলো, মুক্তিবাহিনী এবং সারাদেশের মুক্তিকামী মানুষের নিরন্তর আঘাতে যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত, তখনি ইন্ডিয়া তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গঠিত হয় ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়ে 'যৌথ কমান্ড'। ৩ ডিসেম্বর বিকেলে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন বিমান ঘাটিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তান ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ চলে দুটো ফ্রন্টে। পূর্ব ফ্রন্টে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয় মিত্রবাহিনী। আর পশ্চিম ফ্রন্টে শুধু ইন্ডিয়ান বাহিনী। পূর্ব ফ্রন্টে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পন করে। জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। তাই এই অংশের লড়াই লিবারেশন ওয়ার অব বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে উল্লেখিত। যার ব্যাপ্তি ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর। পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ শেষ হয় ১৯ ডিসেম্বর। তাই ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধ (প্রথমটি ১৯৬৫ সালে) বলে উল্লেখিত। তাই আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ মোটেও ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধ নয়। এমনকি গৃহযুদ্ধও নয়। কারণ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং সরকার গঠিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব আনুষ্ঠানিকভাবেই বিলুপ্ত হয়। প্রসঙ্গত বলতে হয় গত শতকে শুধু বাংলাদেশই আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়; গোটা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় এবং একমাত্র দেশ হিসাবে। তাহলে নরেন্দ্র মোদিরা কেনো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তাদের দলিল দস্তাবেজে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ হিসেবে তাদের নাগরিকদের কাছে বার্তা পৌঁছাবে? কেন বর্তমান ভারতীয় ক্ষমতাসীন দল বিজেপির পেইজসহ ইন্ডিয়ার অন্যান্য পেইজগুলো এটা ইন্দো-পাক যুদ্ধ বলে দাবি করে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপন করবে? কেন হিন্দি 'দৈনিক জাগরণ' ও 'দ্য ইন্ডিয়া টুডে' বলবে, এইদিনে পাকিস্তান ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে! কেন তাদের কোন কথায় বা লেখায় বাংলাদেশের নাম থাকবে না, স্বাধীনতার কথা থাকবে না, লক্ষ শহিদের আত্মদানের কথা থাকবে না? লক্ষ শহিদের আত্মদানের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা কেনো তার এতবড় অপমান? কেনো আমার দেশের শহিদদের এতবড় অবমাননা? ইন্ডিয়ার কাছে এই ধৃষ্টতার জবাবদিহিতা চাইবার মত স্বাধীনতা কি আমাদের আছে? ইন্ডিয়া দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী দেশ, এই দেশটির সঙ্গে যেকোনও ধরনের সম্পর্ক বহুভাবে চিন্তা করার অবকাশ থাকে। এ অঞ্চলে একমাত্র ইন্ডিয়াই প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য সার্বভৌমত্বের হুমকি হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। নেপালকে প্রায় গিলে ফেলেছে। ভুটান থেকেও নেই। মালদ্বীপকে করদ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। তাদের কোনও সেনাবাহিনী রাখতে দেয়নি। শুধু পুলিশ, সেই পুলিশই মালদ্বীপে দিল্লির ইন্দনে সামরিক ক্যু সংঘটিত করেছে। নেপালের কোনও সামুদ্রিক বন্দর না থাকায় তারাও ইন্ডিয়ার ওপর অনেকখানি নিভ্রশীল। দিল্লি সরকারের আজ্ঞা পালনে কিছুটা ব্যত্যয় ঘটলে, নেপালের আমদানি-রফতানি বন্ধ করে দেয় ইন্ডিয়া! অনেকেই বলেন, 'ইন্ডিয়া আমাদের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে।' যদি প্রশ্ন করি, 'ইন্ডিয়া কোথায় আশ্রয় দিয়েছে? আমাদের শরণার্থীদেরকে কি তারা দিল্লি'তে আশ্রয় দিয়েছে?' আমাদের শরণার্থীরা তো আসাম, ত্রিপুরা আর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথাও যায়নি। অন্য কেউ কি তাদের আশ্রয় দিয়েছে? আমাদের স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধারা নিজ টেরিটরিতেই অবস্থান নিয়েছে। তারা নিজ ভুখণ্ডেই আশ্রয় নিয়েছে। আসাম, ত্রিপুরা আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাই পূর্ববঙ্গের বাঙালি ও বাংলাদেশিদের সহযোগিতা করেছে। আর্ন্তজাতিক অনেক সংগঠন রিলিফ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দিল্লি'র শাসকেরা বরং আমাদের শরণার্থীদের রিলিফের টাকা চুরি করেছে, রিলিফ চুরি করেছে। তারা নিজ স্বার্থে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। আমাদের মুক্তিবাহিনীকে যেমন ইন্ডিয়ান বাহিনী নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। তেমনি ইন্ডিয়ান বাহিনীকে আমাদের মুক্তিবাহিনী নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। দুই পক্ষের কমন শত্রুর বেলায় এই ব্যবহারবিধি অত্যন্ত শাস্ত্রসম্মত। একে "সাহায্য" বলার কোন সুযোগ নাই। একে সাহায্য বলার মাধ্যমে পলিটিক্সটা আড়াল করা হয়। একাত্তর সালে ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের কৌশলগত ঐক্য হয়েছিল, এর বেশি কিছু নয়। এই কৌশলগত ঐক্যকে অনেকে দাসখত বলে মনে করলেও আমরা তা মনে করিনা। বরং আমরা মনে করি একাত্তরের প্রেক্ষাপটে আমরা ইন্ডিয়ার কাছে যতটুকু ঋণী ইন্ডিয়ার আমাদের কাছে ঋণ তার থেকে কম নয়। হাজার বছরের প্রতিশোধ নেওয়ার মোক্ষম সুযোগটি ইন্ডিয়াকে আমরা করে দিয়েছি। এবং তা বোঝা যায় সে সময় দেয়া পার্লামেন্টে ইন্দিরা গান্ধীর 'হাজার সালকি বদলা লিয়া' বক্তব্যে থেকে। আমাদের ছিলো স্বাধীনতার যুদ্ধ আর ইন্ডিয়ারটা ছিলো আক্রমণের প্রতিক্রিয়া যুদ্ধ বা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ। অর্থাৎ ইন্ডিয়া অংশ নিয়েছিল নিজেদের স্বার্থেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইন্ডিয়া অর্থনৈতিক, সামরিক, কৌশলগত ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক লাভবান হয়েছিলো। এ কারণে দেশটি তার নিজের স্বার্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়, আমাদের স্বার্থে নয়। আর বাংলাদেশের কারণেই ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সাথে ৪টি যুদ্ধের মধ্যে শুধু একবারই বিজয়ী হয়েছে। সুতরাং একাত্তরে ইন্ডিয়ার মহানুভাবতারও খুব একটা জায়গা নেই। দেশের ভেতরে বিভিন্ন স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে কাশ্মীরী ও পান্জাবীদের প্রতি ইন্ডিয়া সরকারের নির্মম আচরণই তার প্রমাণ। যাইহোক, আপনি দ্বিতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধও বাংলাদেশকে লড়তে হবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি আগেই বলেছি, আমরা কোন যুদ্ধ চাইনা। আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান চাই। আমরা গণভোটের মাধ্যমে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। তারপরেও যদি ইন্ডিয়া আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, আমরা বীরের জাতি, আমরা যুদ্ধকে ভয় পাই না। যুদ্ধে বাঙালি ও বাংলাদেশিদের যে গৌরব আছে, ইন্ডিয়ান ও পাকিস্তানীদের সেই গৌরব নেই। বাঙালি ও বাংলাদেশিরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। ইন্ডিয়ান ও পাকিস্তানীরা সেটা করেনি। সুতরাং আমাদের যে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে তাদের সেই অভিজ্ঞতা নাই।

শামসুল ইসলামঃ আপনারা গণভোটের কথা বলছেন। গণভোটে জিতলে আপনারা কিভাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন? গণভোটে হেরে গেলে আপনারা কী করবেন? আপনারা যে অঞ্চলগুলো দাবি করছেন, গণভোটে তারা যদি 'বাংলাদেশ' এর সাথে যুক্ত হওয়ার পক্ষে ভোট না দিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়, কী করবেন?

হাসনাত আরিয়ান খানঃ গণভোট জিতলে আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবো। সুশাসনকার্য পরিচালনার স্বার্থে সমগ্র 'বাংলাদেশ'কে ২৩ টি প্রদেশে ভাগ করবো। আমরা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করবো। কেন্দ্রের কাছে শুধু পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা এই দু'টি বিভাগ থাকবে। রাজ্যগুলো অনেকটাই স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে। সকল রাজ্যে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের মানুষের সমঅধিকার থাকবে। আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করবো। আমরা একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবো। আমরা সমাজে ইনসাফ কায়েম করবো। আমরা আমাদের কুটনীতিতে পরিবর্তন আনবো। আমরা কাউকে স্থায়ী বন্ধু ভাববো না, আমরা কাউকে স্থায়ী শত্রুও ভাববো না। চায়না ও আমেরিকা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছে। কিন্তু এখন তারা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী। কাজেই কুটনীতিতে স্থায়ী বন্ধু ও স্থায়ী শত্রু বলে কিছু নেই। আজ যে আপনার বন্ধু,

(বাকি অংশ ৯নং পাতায়)

ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি এলে ভাষাচর্চার কথা বলা আর বছরের অন্য মাসে ভুলে থাকা, এটা ঠিক নয়: হাসনাত আরিয়ান খান

(৮নং পাতার পর)

কাল সে আপনার শত্রু হতে পারে। আবার আজ যে আপনার শত্রু, কাল সে বন্ধু হতে পারে। এর নামই কুটনীতি। যেকোন দেশের ‘First line of defence’ হলো সেদেশের কুটনীতি। তারপর সীমান্ত বাহিনী। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বাহিনী। আমরা আমাদের সকল সম্পদের সঠিক ব্যবহার করবো। সর্বোপরি আমরা একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবো। সঠিকভাবে দেশের শাসনকার্য পরিচালনার পাশাপাশি আমরা আর্ন্তজাতিক সমস্যাগুলোর দিকেও নজর দিবো। আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, চায়নার দিকে তাকিয়ে না থেকে বিশ্বের বড় বড় সমস্যাগুলো আমরা সমাধানের উদ্যোগ নিবো। আমরা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবো, বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবো। জাতিসংঘকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবো। আর গণভোটে হেরে গেলে জনগণের রায়ের প্রতি আমরা সন্মান দেখাবো। জনগণ যে রায় দিবে, আমরা সেই রায় মেনে নিবো। গণভোটে তাঁরা যদি স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয়, কোন সমস্যা নেই। আমরা ‘Confederation’ করবো। ‘Confederation’ না হলেও সমস্যা নাই। আমরা এই অঞ্চলের মানুষের মুক্তি চাই, অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাই, জীবনমানের উন্নয়ন চাই।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: আপনারা প্রাদেশিক শাসনের কথা বলছেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলছেন। ইন্ডিয়ার সাথে যে রাজ্যগুলো আছে, সেখানেও তো প্রাদেশিক শাসনই চলছে। এর মাঝে বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মানুষ আছে। তাঁরা কেনো আপনাদের সাথে আসবে? তাঁরা কেনো আপনাদের ডাকে সাড়া দিবে?

হাসনাত আরিয়ান খান: ইন্ডিয়ায় প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা থাকলেও সেখানে সুশাসন নেই। উপরন্তু দিল্লি’র শাসকেরাই সব নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রায় সব ব্যাপারেই দিল্লি সেখানে নাক গলাচ্ছে, হস্তক্ষেপ করছে। ইন্ডিয়া রাজ্যগুলোকে বন্দি করে রেখেছে। ইন্ডিয়ায় বন্দি সেভেন সিস্টার্স, বন্দি সিকিম, বন্দি কাশ্মীর, বন্দি পাঞ্জাব, বন্দি মুসলিম, বন্দি খ্রিস্টান, বন্দি দলিত। ইন্ডিয়া কোন মুক্তিকামী রাষ্ট্র না। এটা বহুজাতিক কারাগার। ছত্তিশগড়, আসাম, মণিপুর, পাঞ্জাব, কাস্মীরে অশান্তির আগুন জ্বলছে। কাস্মীরের স্পেশাল স্ট্যাটাস কেড়ে নিয়েছে। স্বাধীনতাকামী মানুষ সেখানে স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। সিকিম, সেভেন সিস্টাস্রের সমুদ্র নেই, তারা কোনদিকে বেরুতে পারছেনা। ইন্ডিয়ার মূল ভূখণ্ডেই তাদের চিকেন নেক দিয়ে পৌছাতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নেই, ক্ষুধা আছে, দারিদ্র আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে। পশ্চিমবঙ্গকে সাংবিধানিকভাবে ‘ঈ’ ক্যাটাগরি রাজ্য বানিয়েছে। কলকাতাকে বঞ্চিত করে মুম্বাইকে সোনা দিয়ে মোড়ানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বেঙ্গল রেজিমেন্ট নাই। উপরন্তু জনগোষ্ঠীর ২% এর কম পাঞ্জাবী ও শিখরা ৩৫% এর উপর সেনাপদ দখল করে আছে। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের ৪০% কোটা বাঙালিদের জন্য সংরক্ষিত নাই। ৮% জনগোষ্ঠীর পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ১% এরও কম প্রতিনিধিত্ব করছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মানুষেরা অশিক্ষা, বিনা চিকিৎসা, বিচারহীনতা আর দারিদ্রের কষাঘাতে তিলে তিলে মরছে। দিল্লি’র শাসকেরা মানুষকে উঁইপোকার সঙ্গে তুলনা করছে। মানুষের সাথে তারা উঁইপোকার মত ব্যবহার করছে। সেখানে মানুষের জীবনে কোন মর্যাদা নেই। মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন নেই। স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি নেই। দিল্লি’র শাসকদের শাসন, ত্রাসন ও সংহারে বিপর্যস্ত সেখানকার মানুষ। একারণে আমরা যখন একসাথে ছিলাম দিল্লি’র শাসকদের বিরুদ্ধে আমরা সবসময় বিদ্রোহ করেছি। আপনি সেখানে বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মানুষ থাকার কথা বলেছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন। ভাষা, জাতিসত্ত্বা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারণা আলাদা হলে এক থাকা সম্ভব হয় না। একারণে ইন্ডিয়া যতই চেষ্টা করুক, তাদের রাখতে পারবে না। সেখানে এক জাতি গোষ্ঠীর মানুষের সাথে অন্য জাতি গোষ্ঠীর মানুষের মিল নেই, ভাষাগত মিল নেই, সাংস্কৃতিক মিল নেই, কোন দিক দিয়েই মিল নেই। কিন্তু আমরা আমাদের যে অঞ্চলগুলো দাবি করছি, সেখানকার প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীর মানুষের সাথে আমাদের মিল আছে। আমাদের ভাষাগত মিল আছে। আমাদের সাংস্কৃতিক মিল আছে। নৃতাত্বিকভাবে সবাই আমরা একজাতি নাও হতে পারি। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে আমরা এক জাতি। আমরা আগে একসাথে ছিলাম। আমরা যখন একসাথে ছিলাম তখন আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ তিনটি দেশের একটি ছিলাম। আমরা যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের শীর্ষে অবস্থান করছিলাম, আমরা যখন পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম আবাসিক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলাম, ইউরোপ ছিলো তখন অন্ধকারে। পৃথিবীর অনেক দেশই ছিলো তখন অন্ধকারে। আজ যেমন সৌদি আরবের বাদশাহ বাংলাদেশে মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণে অর্থায়ন করেন, আজ থেকে ৬০০ বছরেরও অধিকাল আগে স্বাধীন ও সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলার তৃতীয় সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ সৌদি আরবে দূত পাঠিয়ে মক্কা ও মদিনাতে মাদ্রাসা নির্মাণের অর্থায়ন করেছিলেন। পৃথিবী বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সমৃদ্ধ বাংলা সফর শেষে তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থে লিখেছেন,‘সারা পৃথিবীতে আমি এমন কোন দেশ দেখিনি, যেখানে জিনিসপত্রের মূল্য বাংলার চেয়ে কম দামে বিক্রি হয়।’ ইংরেজরা বাংলা দখলের প্রায় ১৯ বছর পর ১৯৭৬ সালে স্কটল্যান্ডের দার্শনিক অ্যাডাম স্মিথ ‘ওয়েলথ অফ নেশনস’ নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। যেখানে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ তিনটি দেশের মধ্যে বাংলা বা বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করেছিলেন। অথচ সেই দেশকে ইংরেজরা লুটেপুটে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশে পরিণত করেছিলেন। ১৯০ বছর বাংলাদেশ ইংরেজদের দখলে ছিলো। তখন বাংলাদেশকে রক্তশূন্য করা হয়েছে। ইংরেজরা চলে আসার পর প্রায় ২৪ বছর পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানীরা শাসন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, সেভেন সিস্টার্স, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা ও আন্দামানে আজও ইন্ডিয়ার ঔপনিবেশিক শাসন চলছে। পুর্ববঙ্গ পিন্ডি মুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, সেভেন সিস্টার্স, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা ও আন্দামানও অচিরেই দিল্লি মুক্ত হবে ইনশাআলাহ। নিজের ভালোটা সবাই বুঝে। একারণে সবাই আমাদের সাথে আসবে, আমাদের ডাকে সাড়া দিবে। ‘অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন’ সফল হলে আমরা আবার আমাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবো। যতদিন বাঁচবো পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে বাঁচবো। আমরা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ হবো। আমাদের অসংখ্য নদী আছে। আমাদের মৎস্য ও সমৃদ্ধ জলজ সম্পদ আছে। আমাদের সমতল ভূমি আছে। আমাদের উর্বর মাটি আছে। আমাদের পাহাড় আছে। আমাদের বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন আছে। আমাদের সমুদ্র আছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বিশাল সমুদ্রসীমা আছে। আমাদের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং চায়নাসহ পুরো পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সপোর্ট হাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই আমাদেরকে পৃথিবীর একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত করবে। বাংলাদেশ পৃথিবীতে এক নতুন শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ সুপার পাওয়ার হবে।

শামসুল ইসলাম: বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কিসের ভিত্তিতে হয়েছিলো? কেউ কি প্রতিবাদ করেছিলো? ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান কিসের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিলো? যেসব জায়গায় গণভোট হয় নাই, সেসব জায়গা কিসের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিলো?

হাসনাত আরিয়ান খান: এটা একটা একাডেমিক আলোচনার বিষয়, লম্বা আলোচনার বিষয়। ছোট্ট করে যদি বলি, বাঙালির অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে বাংলা দখলের মাধ্যমেই যেহেতু ইংরেজরা উপমহাদেশে তাদের শাসন ব্যবস্থা শুরু করেছেন। একারণে বাঙালির ঐক্যকে তারা সব সময় ভয় পেতেন। ঐক্যবদ্ধ বাঙালির জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের প্রতিষেধক হিসেবেই মূলত বড়লাট কার্জন ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা’র সময়ে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগেনি। ইংরেজদের সময়ে এটা শুরু হয়েছে। ইংরেজ শাসকরা এটা শুরু করেছেন। ইংরেজ শাসকরা তাদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি’র অংশ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প ছড়িয়েছেন। বাঙালি জাতির মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন করে বাঙালি বিদ্বেষীরা নিজেদের আখের গোছাতে চেয়েছেন। শাসক হিসেবে ইংরেজরা হিন্দু মুসলিমের বিভাজনকে বারবার ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তাদের শাসন ব্যবস্থার পুরোটা সময় তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে চলেছেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাজনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তটি ছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির প্রথম বড়সড় প্রশাসনিক নিরীক্ষা। মোদ্দা কথা বাঙালি বিদ্বেষ থেকে অবিভক্ত বাংলা ইংরেজদের চক্রান্তে বিভক্ত করা হয়। বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধির নামে বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করা। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করা। বাংলার জনগণের ব্যাপক বিরোধিতার কারণে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করা হয়। আপনার পরের প্রশ্নের উত্তরে বলছি, ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান ভাগ হয়েছিলো অদ্ভূত ও অবৈজ্ঞানিক ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের দোসর দেশীয় শাসক ও শোষকরা তাদের শোষণের স্বার্থে এটা করেছিলো। কোন ধর্মেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার কথা বলা হয়নি। অথচ আমরা তখন ধর্মের নামে সেটাই করেছি। সেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত টেকেনি। পাকিস্তান টিকেনি। ইন্ডিয়াও টিকবে না। জাতি গঠনে ধর্মের তুলনায় ভাষার কার্যকারিতা অনেক বেশি। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা হলো প্রকৃত বিজ্ঞান ভিত্তিক জাতীয়তা। ইসলাম ধর্মের কথাই যদি বলি, পবিত্র কোরআনে জাতিতে জাতিতে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহপাক বলেছেন, ‘আমি তোমাদের জাতিতে জাতিতে ভাগ করেছি, যেনো তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো।’ কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক কোথাও বলেননি আমি তোমাদের ধর্মে ধর্মে ভাগ করেছি। ১৯৪৭ সালে বাংলার বেশিরভাগ মানুষ ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানের ভাগে যেতে চাননি। তাঁরা নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণ চেয়েছিলেন। বৃহত্তর বাংলা অঞ্চলকে নিয়ে তারা একটি আলাদা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ চেয়েছিলেন। তারা একটি অবিভক্ত বাংলা রাষ্ট্র চেয়েছিলেন। আবুল কাশেম ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরায়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু ও কিরণ শঙ্কর রায়ের মত অধিকাংশ বাঙালি রাজনৈতিক নেতারা এর পক্ষে ছিলেন। আবার নাজিম উদ্দিন ও শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর মত কিছু বাঙালি রাজনৈতিক নেতা এর বিপক্ষে ছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়াকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার পক্ষে মুসলিম লীগের নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ব্রিটিশ-রাজকে দিয়ে আইন করিয়ে নিলেন এবং তাতে অখণ্ড বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো, তখন হিন্দু মহাসভার বাঙালি নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী হিন্দুদের জন্যে বাংলা বিভক্তি দাবি করলেন। এদিকে, মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান থেকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব করলেন এবং শরৎ বসুও তাদের মতের পক্ষে অবস্থান নিয়ে ‘সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক বাংলা’র প্রস্তাব করলেন। হিন্দু মহাসভার পক্ষে কংগ্রেস দল সমর্থন দিলো। শরৎ বসুর স্বাধীন সমাজাতান্ত্রিক বাংলার প্রস্তাব সমাজতন্ত্রের আদর্শবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সমর্থন না করে বাস্তবে হিন্দু মহাসভার শ্যামা প্রসাদের প্রস্তাব সমর্থন করে বাংলা বিভক্তিকে চূড়ান্ত হতে দিলো। এভাবেই হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের লড়াইয়ে বাংলা খণ্ডিত হলো। ১৯৪৭ এর ধর্মীয় বিভাজন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলার মানুষ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের কুফল ভোগ করে আসছে। ব্রিটিশদের আগমন পূর্ব এই বাংলার মানুষের জীবনযাপন স্বচ্ছল ছিল। তৎকালীন ঐতিহাসিকদের লেখাতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রিটিশদের ১৯০ বছরের শাসনের পরে আজ পর্যন্ত বাংলার মানুষের স্বচ্ছলতা ফিরে আসেনি। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে বৃহত্তর বাংলা অঞ্চলের এক হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ১৯৭১ সালে। বলা হয়ে থাকে যদি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যদি দীর্ঘায়িত হতো কিংবা সত্যিকারে সামাজিক বিপ্লব সংগঠিত হতো পারতো তাহলে এ ফল অন্যরকম হতো। ফ্রান্সে ও রাশিয়াতে রাষ্ট্র-বিপ্লব হয়েছে সামাজিক বিপ্লব-সহকারে। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে রাষ্ট্র-বিপ্লব হলেও সামাজিক বিপ্লব হয়নি। তাই পাকিস্তান আমালের শ্রেণী-বিন্যাসই বাংলাদেশ আমলে অক্ষত থেকেছে। যাইহোক, আপনি ভোটের কথা বলেছেন। সত্যিকার অর্থে বাংলা বিভাগের ক্ষেত্রে একটি গণভোট আয়োজন করা উচিত ছিল কিন্তু সেটা তাঁরা কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিলো। তৎকালীন আসাম প্রদেশের সিলেট জেলায় গণভোটের নামে একটা লোক দেখানো আয়োজন হয়েছিলো। এসময় বাংলা থেকে আসাম, উড়িষ্যাকে বিভক্ত করা নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ দুই নেতা পরে জানতে পারেন দিল্লি’তে বাংলা ও আসামকে নিয়ে সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেয়া হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ ভাগ বাটোয়ারাতে কোন ন্যায্যতা ছিলো না। বাঙালি বিদ্বেষ থেকেই ইংরেজরা বাংলার বিভিন্ন অংশ ইন্ডিয়া ও পাকিস্তানকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলো। বাংলা দখল করে ইংরেজরা উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিলো, বের হওয়ার সময় বাঙালিদের হাতেই বাংলাকে তাদের তুলে দেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তারা সেটা করেনি। ইংরেজরা এখন সভ্য জাতি। আশাকরি তারা এখন তাদের পূর্বপুরুষদের কালিমা মোচনের চেষ্টা করবো।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: আপনাদের সাথে কি বিদেশি কোন সংস্থা জড়িত আছে? দেশে ও দেশের বাইরে কি কোন তারকা রাজনীতিবিদ আছেন বা ‘অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন’ সমর্থন করেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: না, আমাদের সাথে কোন বিদেশি সংস্থা জড়িত নেই। আমাদের কোন বিদেশি সংস্থার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি আর্থিক দিকে ইঙ্গিত করে বলে থাকেন তাহলে বলছি, আমরা চাকরি করে, ব্যবসা করে পরিশ্রম করে যা আয় করছি, তা এই আন্দোলনের পেছনে ব্যয় করছি। প্রয়োজন হলে দেশের মানুষের কাছে হাত পাতবো, ক্রাউড ফান্ডিং করবো। তবু বিদেশি কোন সংস্থার কাছে আমরা হাত পাতবো না। এটা আমাদের জন্য মর্যাদাকর না। দেশে ও দেশের বাইরে অনেকেই আমাদের সমর্থন করেন। যারাই আমাদের সমর্থন করেন, তারাই আমাদের কাছে তারকা। এখন দেশে ও দেশের বাইরে তারকা এবং রাজনীতিবিদ বলতে আপনি যদি সাকিব আল হাসানকে বুঝিয়ে থাকেন, সেটা সাকিব আল হাসানই ভালো বলতে পারবেন। আমাদের এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তরা বেশিরভাগই তরুণ। আমরা তরুণদের সম্পৃক্ত করার পেছনেই সময় ব্যয় করছি। প্রতিদিন আমরা তরুণদের সম্পৃক্ত করছি। আমরা বিশ্বাস করি তারুণ্যে। বাংলাদেশের স্রষ্টা হচ্ছে বাঙালি তারুণ্য। এটি ইতিহাস। তাই ‘অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন’ বাস্তবায়ন করতে হলে তারুণ্যকে এগিয়ে আসতে হবে। কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান। সময় বদলাচ্ছে। বাঙালি জাগছে, বাংলাদেশিরা জাগছে। আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আন্দোলনে সবাই পা মেলান।

শামসুল ইসলাম: আপনারা গুণীজনদের সম্মাননায় একটি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত কমিউনিটির বরণ্যে গুণীজনদের কেউ ৪২, ৫২, ৫৭, ৬৯ ও ৭১ বছরে পদার্পণ করলে “অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোল” এর পক্ষ থেকে তাঁর জন্মদিন উদযাপনের কথা জানিয়েছেন। ৫২ তে ভাষা আন্দোলন, ৫৭ তে পলাশী, ৬৯ এ গণঅভ্যুত্থান ও ৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু ৪২ এ কী বুঝিয়েছেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: আমরা শুধু জানাইনি, পালনও করেছি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, কমিউনিটির অনুকরণীয় অগ্রজ সাংবাদিক ও সম্পাদক, ‘যিসাসের আগমন অনিবার্য’ কবিতার লেখক সকলের পরম শ্রদ্ধেয় কবি ও কলামিস্ট ফরীদ আহমদ রেজা’র ৭১তম জন্মদিন আমরা উদযাপন করেছি। গুণীজনকে মরণোত্তর সম্মানিত করার প্রচলিত চর্চা ভেঙে বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির মুরুব্বী ফরীদ আহমদ রেজা’র জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে ‘অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন’ এদিন পূর্ব লন্ডনে উৎসবমূখর পরিবেশে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এবং গুণীজনদের সম্মাননায় এধরণের আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেইসাথে দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত কমিউনিটির বরণ্যে গুণীজনরা কেউ ৪২, ৫২, ৫৭, ৬৯ ও ৭১ বছরে পদার্পণ করলে “অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন” এর সাথে সংশ্লিষ্টদের জানাতে সকলকে বিনীতভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। যাইহোক, ৫২ তে ভাষা আন্দোলন, আপনি ঠিকই ধরেছেন। এছাড়া ১৩৪২-৫২ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার খণ্ড খণ্ড অংশগুলোকে একত্রীকরণের মাধ্যমে ভাষাগত জনজাতি রাষ্ট্র ‘বাঙ্গালাহ’ প্রতিষ্ঠা করেছেন। একারণে ৪২ সংখ্যাটাকেও উদযাপনের জন্য রাখা হয়েছে।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: অনেকেই বলে, আপনি শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ’র বংশধর। এটা সত্যি কি-না? আপনি ইলিয়াস শাহ’র ওয়ারিশ কি-না?

হাসনাত আরিয়ান খান: এটা সত্যি না মিথ্যা, আমি জানি না। কারো কারো মতে আমার পূর্বপুরুষ ১২২৭ শতাব্দীতে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। আবার কারো কারো মতে ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী শহর সিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। একইসময়ে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ’র পূর্বপুরুষও সেখান থেকেই ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন। একারণে অনেকেই এমনটা মনে করেন। তবে এর পক্ষে বা বিপক্ষে কোন দালিলিক প্রমাণ নেই। ১৪৯০ খ্রি: পর ইলিয়াস শাহ্’র বংশধরদের ব্যাপারে আর কিছুই জানা যায় না। ‘সালতানাত-ই-বাঙ্গালাহ’ বা ‘অখণ্ড বাংলাদেশ’ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ’র বংশধর হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তিনি আমাদের জাতির পিতা। বংশ হিসাব করলে আমরা সবাই তার বংশধর। বাঙালি ও বাংলাদেশিরা আমরা সবাই তাঁর উত্তরসূরি।

শামসুল ইসলাম: শুনেছিলাম, আপনাকে একটা নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিতে চেয়েছিলো আই মিন সম্মানসূচক ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচ.ডি) না ডক্টর অব লেটার্স (ডি. লিট) কী যেনো একটা দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু আপনি রাজি হননি। কেনো জানতে পারি?

হাসনাত আরিয়ান খান: তাদের পিএইচডি পলিসি এখনো সার্কুলেট হয়নি। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আমার পছন্দ হয়নি। এজন্যই রাজি হয়নি। এছাড়া বিশেষ কোন কারণ নেই।

মুহাম্মাদ শরীফুজ্জামান: ‘অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলন’ নিয়ে আপনার এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারটি একসাথে তিনটি কাগজে প্রকাশিত হবে। ‘সাপ্তাহিক সুরমা’, ‘বালাগঞ্জ প্রতিদিন’ ও ‘ফ্রান্স দর্পণ’ এই তিন কাগজ এবং এর পাঠকদের উদ্দেশে কিছু বলবেন?

হাসনাত আরিয়ান খান: প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই আমাদের উপমহাদেশে সংবাদ পত্রের আত্মপ্রকাশ। 'সংবাদ কৌমুদি', 'বেঙ্গল গেজেট', 'ধূমকেতু', 'ফরোয়ার্ড ব্লক', 'সমাচার দর্পন', 'সংবাদ প্রভাকর', 'দিকদর্শন', 'লাঙল', ইত্যাদি সমস্ত পত্রিকার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ তাড়ানো। ব্রিটিশ বিরোধী জনমত ও আন্দোলন গড়ে তুলতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই সংবাদ পত্রকেই হাতিয়ার করেছিলেন। এমনকি সংবাদপত্রের মালিক সম্পাদকরা গ্রেফতার পর্যন্ত হয়েছিলেন। 'ধূমকেতু' সম্পাদক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক বছর জেল খেটেছিলেন। ইলবার্ট বিল থেকে শুরু করে ভের্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট সবই করেছে তখনকার সংবাদপত্র। অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি তৈরী করতে সংবাদপত্র মূল ভূমিকা নিয়েছিল। কাজেই সংবাদ পত্র নিছকই কিছু তথ্যের সমষ্টি নয়। সংবাদ পত্র ইতিহাসের দলিল। ‘দৈনিক আজাদ’ পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পুরোধা ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুদ্ধপূর্ব পাকিস্তান আমলে ‘দৈনিক ইত্তেফাক’, ‘দৈনিক পূর্বদেশ’, ‘দৈনিক সংবাদ’ ও ‘দৈনিক জনপদ’, বাঙালির জনচৈতন্যকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ ও ঐকমত্য তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে অগ্রসর করে বিজয়ের দরজায় পৌঁছে দিয়েছিল। 'সাপ্তাহিক যায় যায় দিন' এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংস্কৃতিমনা তরুণদের মনোভাবকে শাণিত করেছিলো। বিলেতে বাঙালি ও বাংলাদেশিদের প্রধান দুই মুখপত্র 'সাপ্তাহিক জনমত' ও 'সাপ্তাহিক সুরমা' আত্মপ্রকাশের সঙ্গে ভাষাভিত্তিক বাঙালি ও বাংলাদেশি জাতীয় রেনেসাঁসের সাথে যুক্ত হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়ে যায়নি। প্রকৃত মুক্তি আমাদের আসেনি। আমাদের চূড়ান্ত বিজয় আজও আসেনি। আমরা শুধু ‘বাংলাদেশ’ এর এক খণ্ডের স্বাধীনতা নিয়ে বসে আছি। অর্থাৎ, আমরা শুধু ‘মাথা’ নিয়ে বসে আছি। পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আন্দামান, আরাকান ও শান নামক আমাদের হাত-পাগুলো আজও বিচ্ছিন্ন। একাত্তর সালে স্বাধীন ‘বাংলাদেশ’ এর জনসংখ্যা ছিলো সাড়ে সাত কোটি। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর জনসংখ্যা হয়েছে আঠারো কোটি। কিছুদিন পর ত্রিশ কোটি হবে, চল্লিশ কোটি হবে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী ৫০ বছর পর বাংলাদেশের অর্ধেক জমি সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে। বাংলাদেশের কৃষি জমি এমনিতেই কমে আসছে। তখন এই মানুষগুলো কোথায় থাকবে? কী খাবে? এছাড়া আশির দশকে বার্মায় জেনারেল ‘নে উইন’ যেভাবে আদমশুমারির নামে রোহিঙ্গাদের একটা অংশকে বিদেশি ঘোষণা করে নিপীড়ন করে বাংলাদেশে পুশ ইন করেছিলো তেমনিভাবে বর্তমান মিয়ানমারের সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের বাঙালি বলে মেরেকেটে বাংলাদেশে পুশ ইন করেছে। কক্সবাজারে প্রায় তেরো লাখ রোহিঙ্গা বাঙালি আশ্রয় নিয়েছে। ঠিক একইভাবে ইন্ডিয়ার দখলে থাকা বাঙালি অধ্যুষিত প্রদেশগুলো থেকে বাঙালিদের তাড়াতে নরেন্দ্র মোদি সরকার জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) প্রণয়নের ঘোষণা দিয়েছে। মোদি সরকারও একই রকম কৌশল অবলম্বন করে নাগরিকপঞ্জির আড়ালে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষের নাগরিকত্ব বাতিল করার চক্রান্ত করছে। ইতোমধ্যে আসামে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করে নতুন করে নাগরিকপঞ্জি তৈরী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেখানে ১৯ লাখ ৬ হাজার ৬৫৭ জন বাঙালিকে নাগরিকত্বহীন করা হয়েছে। তাঁদের পাসপোর্ট, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, জমানো টাকা, বাড়ি-ঘর, জমির দলিল সবই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই ১৯ লাখ ৬ হাজার ৬৫৭ জন নাগরিকত্বহীন মানুষ বর্তমানে ডিটেনশন ক্যাম্পে খুবই মানবেতর জীবন যাপন করছে। আসাম থেকে ৪০ লাখ বাঙালিকে তারা বের করার পরিকল্পনা করছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় বজরং দল বাংলাদেশি মুক্ত ভারতের কথা উল্লেখ করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আন্দামানেও এই বিল আনার তোড়জোড় চলছে। এই যে বিভীষিকা, এই বিভীষিকা রোধ করতে হলে ইন্ডিয়া ও মিয়ানমারের কাছ থেকে আমাদের টেরিটরিগুলো ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের হাত-পাগুলো মাথার সাথে যুক্ত করতে হবে। ইন্ডিয়া ও মিয়ানমারকে আমাদের টেরিটরিগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা আমাদের ঐতিহাসিক দাবি। ইন্ডিয়া ও মিয়ানমার যেদিন আমাদের টেরিটরিগুলো ফিরিয়ে দিবে, একমাত্র সেদিন তাদেরকে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র বলা যাবে। তার আগে দখলদার ইন্ডিয়া ও মিয়ানমারকে কিছুতেই আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র বলা যাবে না। আমরা বিভিন্ন সময়ে অখণ্ড বাংলাকে হারিয়েছি আবার ফিরে পেয়েছি। কিন্তু ব্রিটিশরা চলে আসার ৭৭ বছর পরেও আমরা অখণ্ড বাংলাকে আর ফিরে পাইনি। ইন্ডিয়া ও মিয়ানমারের শাসকেরা আমাদেরকে আর ফিরিয়ে দেয়নি। তবে বাংলার বিদ্রোহী চেতনা তো ফুরিয়ে যায়নি। ইতিহাস বলছে, বাংলা কখনো অন্য কোনো অঞ্চলের বশ্যতা সহজে মেনে নেয়নি। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জনগণের নাগরিক অধিকার এবং মানবতার পক্ষে অবস্থান নিতে গিয়ে সংবাদপত্রকে দখলদারের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। সংবাদপত্রকে জাতির আশা-আকাংখা তুলে ধরতে হয় ও নাগরিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হয় এবং মানুষের মানবিক চেতনা জাগ্রত করতে হয়। সংবাদপত্র হচ্ছে বিশ্বে জনমত গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আসুন আমরা জনমত গড়ে তুলি। বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশিদের দুর্দিন চলছে। সামনে মহাবিপদ। বাংলার বিরাট ভূখণ্ডের ভূমিপুত্ররা নিজ ভূখণ্ডে একাধিকবার গণহত্যার শিকার হয়েছে, এথনিক ক্লিনজিংয়ের শিকার হয়েছে আর এখন এনআরসি’র জাঁতাকলে মরছে। ইন্ডিয়া ও মিয়ানমারে রীতিমতো ‘বাঙালি’ এবং ‘বাংলাদেশি’ শব্দ দুটো প্রায় ভয়ংকর অপমানজনক শব্দে পরিণত হয়েছে। তারা চায় বাংলা বলয়ের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করতে। তারা চায় বাংলাদেশকে বৃত্তবন্দী করতে। ফলে জরুরি হয়ে উঠেছে বাঙালি ও বাংলাদেশি খেদানো। যে বাঙালি ও বাংলাদেশিদের বাংলা বা বাংলা বলয়, সেখান থেকে বাঙালি ও বাংলাদেশিদের খেদানোর চিন্তা করাও এক ঘোরতর নৈতিক অপরাধ। ইন্ডিয়া রাষ্ট্রটির জন্ম ১৯৪৭ সালে। কিন্তু এই ভূমি তো ১৯৪৭ সালে রচিত হয়নি! এই মানুষ, মানুষের পূর্বপুরুষ, ভূমিপুত্ররা তো ১৯৪৭ সালেই এ অঞ্চলের বাসিন্দা হয়নি! বাঙালিরা যুগ যুগ ধরে আছে নিজভূমে, বাঙালিদেরই এলাকায়। একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে তার নিজভূমে পরবাসী বানানোর সিদ্ধান্ত ন্যায়ত কোনো আইন হতে পারে না। আসুন, আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি। আসুন আমরা আমাদের বাংলা বলয়ের সকল বাংলাভাষীর জন্য একটি ‘অখণ্ড বাংলাদেশ’ রাষ্ট্রের দাবি করি। আসুন আমরা আমাদের সেই গৌরবময় অতীত ফিরিয়ে আনি। আসুন আমরা ‘অখণ্ড বাংলা’র প্রথম স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা'র বাংলা ফিরিয়ে আনি। আসুন সমগ্র বাংলা অঞ্চলকে বাংলাদেশের সাথে অন্তর্ভূক্ত করে 'অখণ্ড বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে আন্দোলনে নামি। নিজ দেশের পাশাপাশি বিদেশেও জনমত গড়ে তুলি। আমরা সমস্বরে আওয়াজ তুলি। আসুন আমরা আবার একসাথে লড়ি। দর্শক থেকে সমর্থক হোন, সমর্থক থেকে সহযোদ্ধা হোন, তারপর জাতির সেনাপতি হোন। এ লড়াই সবার।

শামসুল ইসলাম: ব্যস্ততার মধ্যেও সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

হাসনাত আরিয়ান খান: আপনাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। #